১. শহীদ বীর শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন
বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন ১৯৩৪ সালে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলাধীন বাগপাচরা গ্রামে (বর্তমানে সোনাইমুড়ী উপজেলা) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আযহার মিয়া এবং মাতার নাম মোসাম্মৎ জুলেখা খাতুন।

২. ওবায়দুল কাদের : (রাজনীতিবিদ)
ওবায়দুল কাদের ১৯৫২ সালের ১ জানুয়ারি নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানার বড় রাজাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোশারফ হোসেন এবং মাতা ফজিলাতুন্নেছা। কাদের স্থানীয় বসুরহাট 'সরকারি এএইচসি উচ্চ বিদ্যালয়' থেকে মাধ্যমিক ও নোয়াখালী সরকারি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

৩. শহীদ বুদ্ধিজীবী এ.এন.এম. মুনীর চৌধুরী
শহীদ বুদ্ধিজীবী এ.এন.এম.মুনীর চৌধুরী ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিধর ভাস্কর এবং দক্ষ কারুকার। তিনি ১৯২৫ সালের ২৭শে নভেম্বর ঢাকা জিলার মানিকগঞ্জে পিতার কর্মস্থলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানাধীন গোপাইরবাগ গ্রামে।

৪. হবিবুর রহমান: (মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী) হবিবুর রহমান ১৯২১ সালের ১ জানুয়ারি নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার বালিয়াধার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বাঙালি শিক্ষাবিদ এবং অধ্যাপক। নোয়াখালী জেলাস্থ চাটখিল উপজেলার দত্তপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে থেকে ১৯৩৮ সালে পাঁচটি বিষয়ে লেটারসহ স্টারমার্ক পেয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি ভর্তি হন তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে।

৫. আতাউর রহমান: (মঞ্চ ও টেলিভিশন অভিনেতা, মঞ্চ নির্দেশক এবং লেখক) আতাউর রহমান ১৮ জুন ১৯৪১ খ্রি. নোয়াখালীত জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধপরবর্তী মঞ্চ নাটক আন্দোলনের অগ্রদূত। ১৯৭২ সালে তিনি তার প্রথম নাটকের নির্দেশনা প্রদান করেন। তার নির্দেশিত প্রথম মঞ্চ নাটক মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। একাডেমির ফেলো এবং ১৯৯২ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রাইড অফ পারফরম্যান্স পুরস্কার।

৬. চিত্তরঞ্জন সাহা: (বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের একজন পথিকৃৎ, বাংলা একাডেমি বই মেলার উদ্যোক্তা) তিনি ০১ জানুয়ারি ১৯২৭ সালে বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৩ সালে মোহাম্মদপুর রামেন্দ্র মডেল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৪৮ সালে চৌমুহনী এসএ কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউসের সামনে বটতলায় এক টুকরো চটের উপর কলকাতা থেকে আনা ৩২ টি বই সাজিয়ে তিনি বই মেলার সূচনা করেন।

৭. আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল: (গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক, গায়ক, মুক্তিযোদ্ধা) আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের জন্ম ১৯৫৬ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকায়। তার পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার আটিয়াকান্দি। তিনি ১৯৭১ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি চলচ্চিত্র সংগীত পরিচালনায় আসেন ১৯৭৮ সালে 'মেঘ বিজলী বাদল' সিনেমা দিয়ে।

৮. কবির চৌধুরী: (একজন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক)
কবীর চৌধুরী (পুরো নাম আবুল কালাম মোহাম্মদ কবীর) ১৯২৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন।

৯. আবদুশ শাকুর: (বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব, সাহিত্যিক ও সুরকার)
আবদুর শাকুর ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ সালে নোয়াখালী সদর উপজেলার রামেশ্বরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, রচনা সাহিত্যিক, রবীন্দ্র-গবেষক, সঙ্গীতজ্ঞ ও গোলাপ-বিশেষজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে লেকচারার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে তিনি পাকিস্থান সিভিল সার্ভিসে যোগদান

১০. ঝর্ণা ধারা চৌধুরী: (সমাজ কর্মী ও নোয়াখালী গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এর সাবেক সেক্রেটারি) ঝর্ণা ধারা চৌধুরী লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়নের কালুপুর গ্রামে ১৯৩৮ সালের ১৫ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী জেলায়। তিনি ছিলেন একজন বাংলাদেশী সমাজকর্মী যিনি নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি উপজেলার 'গান্ধী আশ্রম' এর সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনিগান্ধীর প্রতিষ্ঠিত অম্বিকা কালিগঙ্গা চ্যারিটেবল ট্রাস্টে (গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট) যোগ দেন।

১১. প্রণব ভট্ট: (ঔপন্যাসিক)
তিনি একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন। তার জন্ম ৫ জানুয়ারি ১৯৫০ নোয়াখালীর মাইজদীতে। তার আবির্ভাব ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে। টেলিভিশনের জন্য ধারাবহিক নাটক লিখে তিনি সাহিত্যামোদী মানুষের দৃষ্টিআর্কষণ করতে সক্ষম হন। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশের ওপরে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থহলো- প্রেয়সী, বলো তুমি কার, অভিমানী, অন্তরে তুমি, বাতিল ইত্যাদি। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের জন্য নাটক রচনা করেছেন অসংখ্য। উল্লেখযোগ্য নাটক- 'সোনার কাকন', 'আংটি', 'বন্যার চোখে জল', 'হিয়ার মাঝে। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে তার অকাল প্রয়াণ হয়।

১২. আনিসুল হক: (রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এবং টেলিভিশন উপস্থাপক)
আনিসুল হকের জন্ম নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জে ১৯৫২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক)সম্মান (ডিগ্রি অর্জন করেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ এর দশকে টেলিভিশন উপস্থাপক হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তার উপস্থাপনায় 'আনন্দমেলা' ও 'অন্তরালে' অনুষ্ঠান দুটি জনপ্রিয়তা পায়। ১৯৮৬ সালে তার নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান "মোহাম্মদী গ্রুপ" প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রুপটির তৈরি পোশাক, বিদ্যুৎ, তথ্যপ্রযুক্তি, আবাসন, কৃষিভিত্তিক শিল্প কারখানা রয়েছে। আনিসুল হক ২০০৫ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিজিএমই এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০০৮ সালে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০১০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত তিনি সার্ক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতির দায়িত্ব করেন। আনিসুল হক আশির দশকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ২০১৫ সালে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে মেয়র পদের জন্য মনোনয়ন লাভ করেন এবং বিজয়ী হন। ৩০ নভেম্বর ২০১৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৩. শিরীন শারমিন চৌধুরী: (দেশের প্রথম নারী স্পিকার, রাজনীতিবিদ)
শিরীন শারমিন চৌধুরী ১৯৬৬ সালের ৬ অক্টোবর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার সিএসপি অফিসার ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব রফিকুল্লাহ চৌধুরীর কন্যা। তিনি ১৯৮৩ সালে এসএসসি, ১৯৮৫ সালে এইচএসসি এবং ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ও ১৯৯০ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলএম সম্পন্ন করেন। ২০০০ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের এসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে পিএইচডি লাভ করেন। তার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল সংবিধানিক আইন ও মানবাধিকার। ১৯৯২ সালে তিনি আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ৩০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে তিনি নবম জাতীয় সংসদের স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হন।

১৪. মোতাহের হোসেন চৌধুরী: (শিক্ষাবিদ ও লেখক)
মোতাহার হোসেন চৌধুরী ১৯০৩ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্যে আগ্রহী হয়ে উঠেন। প্রথমদিকে কবিতা বেশি লিখতেন এবং বাঙালি মুসলমান সমাজের অগ্রগতির আন্দোলন হিসেবে পরিচিত "বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন" এর সাথে যুক্ত ছিলেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ "সংস্কৃতি কথা" (১৯৫৮)। এছাড়াও তার অনুবাদকৃত দুটি গ্রন্থ হচ্ছে- ক্লাইভ বেলের Civilization গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত *সভ্যতা*(১৯৬৫) এবং বার্ট্রান্ড রাসেলের *Conquest of Happiness* গ্রন্থের অনুবাদ *সুখ*(১৯৬৫)। চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনা কালে ১৯৫৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৫. ফেরদৌসী মজুমদার: (অভিনেত্রী)
তার জন্ম ১৮ জুন ১৯৪৩ সালে এবং পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানাধীন গোপাইরবাগ গ্রামে। তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রায় তিনশ'র মতো নাটক করেন।তার অভিনয় জীবন প্রায় তিন দশকের মতো দীর্ঘ। তার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হচ্ছে- কোকিলারা, এখনো ক্রীতদাস, বরফ গলা নদী, জীবিত ও মৃত, অকুল দরিয়া, সংশপ্তক, চোখের বালি, শঙ্খনীল কারাগার, এখনও দুঃসময়, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য পদক- একুশে পদক (১৯৯৮), স্বাধীনতা পুরস্কার (২০২০), শহিদ আলতাফ মাহমুদ স্মৃতি পদক ইত্যাদি।

১৬. সা'দত হুসাইন: (একজন মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক মন্ত্রীপরিষদ সচিব এবং সরকারি কর্ম কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান)
সা'দত হুসাইন ২৪ নভেম্বর ১৯৪৬ সালে নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বাংলাদেশী আমলা এবং দেশের অন্যতম প্রধান সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন' এর নবম চেয়ারম্যান। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রধান তথা বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীপরিষদ সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।
শিক্ষাজীবন শেষে পাকিস্তান আমলে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তানে (সিএসপি) যোগ দেন। ১৯৭১ তিনি নড়াইলে শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। তিনি এপ্রিল মাসে ভারত গমন করেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারে যোগ দেন। তিনি ২০০২-২০০৫ মেয়াদে মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস থেকে যথারীতি অবসর গ্রহণ করেন। ২০০৭ সালে তিনি বাংলাদেশ পাবলিক কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন এবং

২০১১ পর্যন্ত এ পদের দায়িত্ব পালন করেন। অবসর জীবনে তিনি লেখালেখি করেছেন। তার লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো ছেঁড়া কথার উড়াল ফানুস, নীচু স্বরে উঁচু কথা, স্মৃতি-প্রীতির সজীব পাতা, রুক্ষ সূক্ষ হীর মুক্তো। এছাড়া তিনি একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ভারতে গিয়ে প্রবাসী সরকারে যেভাবে দায়িত্ব পালন করেন, তা তিনি লিখে গেছেন 'মুক্তিযুদ্ধের দিন-দিনান্ত' বইয়ে। ২২ এপ্রিল ২০২০ সালে ৭৩ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৭. জুয়েনা আজিজ: (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিনিয়র সচিব)
বিসিএস প্রশাসন ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা জুয়েনা আজিজ বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক হিসেবে কর্মরত আছেন। তার জন্ম ০১ জানুয়ারি ১৯৬১ সালে নোয়াখালী সদর উপজেলায়। ইডেন মহিলা কলেজ থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। পরে তিনি ব্রাডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা, বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিডিং ইকনোমিক গ্রোথ বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে কর্মে যোগদান করে তিনি দীর্ঘ ৩৪ বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। কর্ম জীবনে তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সচিব), তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সিনিয়র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চাকুরী জীবনে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি এন্ড অপারেশন), স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ শাখার প্রধান এবং মনিটরিং, ইন্সপেকশন এন্ড ইভাল্যুয়েশন উইং-এর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
২০১৬ সালের ১১ মে তাকে পদোন্নতি দিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগ ও পরে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সচিব পদমর্যাদায় সদস্য করা হয়। ২০১৮ সালের ৮ জুলাই থেকে ২০১৯ সালের ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব ছিলেন। ২০১৯ সালের ২১ জানুয়ারি সচিব হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন ও ৩০ জানুয়ারি তাকে সিনিয়র সচিব হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়। তিনি ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৮. মাহমুদুর রহমান বেলায়েত: (মুক্তিযুদ্ধকালীন কমান্ডার, বিএলএফ (মুজিব বাহিনী), বৃহত্তর নোয়াখালী)
তিনি ১ জুলাই ১৯৪৫ সালে নোয়াখালী সদরের গুপ্তাংক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নোয়াখালী জেলা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি ছিলেন মুজিব বাহিনীর প্রধান। তিনি সাবেক নোয়াখালী-১০ (বেগমগঞ্জ উপজেলা) সংসদীয় আসনে ২ বার (১৯৭৩ এবং ১৯৮৬) সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯. আমিনুল হক: (বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ অ্যাটর্নি জেনারেল, আইনজীবী)
আমিনুল হক ৪ এপ্রিল ১৯৩১ সালে নোয়াখালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত এবং ১৯৬৯ সালে ঢাকা সেনানিবাসে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হাতে নিহত সার্জেন্ট জহুরুল হকের বড় ভাই ছিলেন। ১৩ জুলাই ১৯৯৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২০. মালেক আফসারী: (চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্র নাট্যকার)
মালেক আফসারী একজন বাংলাদেশী চলচ্চিত্র পরিচালক। তার জন্ম বসন্তপুর, নোয়াখালী। ১৯৮৩ সালে *ঘরের বউ* চলচ্চিত্র পরিচালনার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৮০-এর দশকে তিনি প্রযোজনা সংস্থা রোজী ফিল্মসের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রখ্যাত অভিনেত্রী রোজী আফসারী তার দাম্পত্য সঙ্গী ছিলেন। তার পরিচালিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হল *ক্ষতিপূরণ* (১৯৮৯), *ক্ষমা* (১৯৯২), *ঘৃণা* (১৯৯৪), *দূর্জয়* (১৯৯৬), ও *এই ঘর এই সংসার* (১৯৯৬)।

২১. কাজী গোলাম রসুল: (বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারক)
বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারক কাজী গোলাম রসুল ১৯৪১ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী মকবুল আহমেদ এবং মাতর নাম সুফিয়া খাতুন। ক্ষণজন্মা এ বিচারক তাঁর নিজ গ্রামে অবস্থিত তুলাচারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাল্য শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি গোপালপুর আলী হায়দার উচ্চ বিদ্যালয় হতে মাধ্যমিক, চৌমুহনী এস এ কলেজ হতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর আইন বিভাগ হতে তিনি এল.এল.বি ডিগ্রী লাভ করেন।
কৃর্তিমান এ বিচারক ব্যাকার হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। অল্প কিছুদিন ব্যাংকে চাকুরি কারার পর তিনি ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানায় মুন্সেফ (বিচার বিভাগ) হিসেবে যোগদান করেন। বিচারক হিসেবে তিনি মৌলভীবাজার, সন্দ্বীপ, রাউজান, কক্সবাজার, চাঁদপুর, কিশোরগঞ্জ এবং দিনাজপুর জেলায় অত্যন্ত সুনামের সাথে বিচারকার্য সম্পাদন করেন। দক্ষ ও স্বনামধন্য বিচারক হিসাবে তিনি নড়াইল, ঝালকাঠি, ফরিদপুর এবং ঢাকা জেলার জেলা ও দায়রা জজ পদে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিচারিক দায়িত্ব পালন করেন। বিচার বিভাগের কর্মকালে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর রেজিস্ট্রার এবং পিডব্লিউডি

এর আইন উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা জেলার জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন। ইতিহাসের জঘন্যতম এ হত্যাকান্ডের বিচারকার্য সম্পাদন করে তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।
তাঁর প্রজ্ঞা, কর্মনিষ্ঠা ও সাহস তাঁকে একজন খ্যাতিমান বিচারক হিসেবে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিচার বিভাগীয় কর্মকাল শেষে তিনি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কীর্তিমান এ বিচারকের কোন অবসর জীবন ছিল না। জীবন সায়াহ্নেও তিনি ব্যাংকিং সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ২০১৪ সালে ন্যাশনাল ব্যাংকে কর্মরত অবস্থায় ১১ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। মৃত্যুর সময় তিনি স্ত্রী ও তিন কন্যা রেখে যান।

২২. শাহাদাত হোসেন চৌধুরী: (সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, বর্তমানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের একজন কমিশনার)
শাহাদাত হোসেন চৌধুরী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল যিনি বর্তমানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের একজন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শাহাদাত হোসেন ১৯৫৯ সালে নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আলী ইমাম চৌধুরী এবং মাতার নাম ফেরদৌস আরা বেগম। ১৯৭৪ সালে বসুরহাট সরকারি এএইচসি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক এবং ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন।
শাহাদাত হোসেন ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৮২ সালে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সিগন্যাল কোরে কমিশন লাভ করেন। তৎকালীন বিডিআরের চট্টগ্রাম ও দিনাজপুরের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মরত অবস্থায় তিনি লাইবেরিয়া ও সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের সামরিক টেলিযোগাযোগ প্রকৌশল কলেজ থেকে প্রকৌশলী ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে ডিফেন্স সার্ভিসেস কম্যান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ থেকে পিএসসি এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ থেকে এএফডব্লিউসি ডিগ্রী লাভ করেন।
২০০৭ থেকে ২০১০ সালের জুন পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ সরকারের ছবিসহ ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন প্রকল্পে জাতীয় প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০ সালের জুনে তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ করেন। অবসরগ্রহণের পর কিছুকাল জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীন আফগানিস্তানে কাজ করেন। ২০০৮ সালে নেপালের সাধারণ নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ও ২০১১ সালে আফগানিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। ২০১৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে শাহাদাত হোসেন, কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বে গঠিত পাঁচ সদস্যের বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ কর্তৃক নিয়োগ পান।

২৩. হেমপ্রভা মজুমদার: (ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিকন্যা)
হেমপ্রভা মজুমদার ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিকন্যা। হেমপ্রভা মজুমদার ১৮৮৮ সালে নোয়াখালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গগনচন্দ্র চৌধুরী ও মাতার নাম দিগম্বরী দেবী। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হন। ১৯২১ সালে 'নারী কর্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। হেমপ্রভা মজুমদার ১৯২২ সালেই 'মহিলা কর্মী- সংসদ' নামে একটি কর্মী সংগঠন গঠন করেন। এর আগে তিনি ১৯২১ সালে চাঁদপুর ও গোয়ালন্দ স্টিমার ধর্মঘট চলার সময় স্বামী বসন্তকুমার মজুমদারের পাশে থেকে ধর্মঘটকারীদের এবং আসামের অসহায় চা-বাগান শ্রমিকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এসব কাজ করার কারণে বহুবার তাকে কারাবরণ হয়েছে। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এজন্য জেলে যেতে হয়। এক বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৭ সালে হেমপ্রভা মজুমদার বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে নেতাজী 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন। হেমপ্রভা মজুমদার সেসময় তাতে যুক্ত হন। ১৯৪৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনেরও অল্ডারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। হেমপ্রভা মজুমদার ১৯৪৬ সালের ৩১ জানুয়ারি মারা যান।

২৪. আবুল কালাম আজাদ: (বীর বিক্রম)
শহিদ আবুল কালাম আজাদের জন্ম নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানার বিনোদপুর ইউনিয়নের বিনোদপুর গ্রামে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা যুদ্ধে তার সাহসিকতার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে বীর বিক্রম খেতাব প্রদান করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন আবুল কালাম আজাদ। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। সে সময়ে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ ছিল না। অনেকদিন পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে জানানো হয়, আবুল কালাম আজাদ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন।

২৫. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী: (মননশীল প্রবন্ধকার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং বুদ্ধিজীবী ছিলেন)
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ২২ জুলাই ১৯২৬ খ্রি. বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার খালিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নোয়াখালীর সোনাপুরের আহমদিয়া হাই ইংলিশ স্কুল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায়

অবতীর্ণ হন ও মেধা তালিকায় ৪র্থ স্থান লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৪৬-১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করে "সাহিত্যভারতী" উপাধি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আল-বদর বাহিনী তাকে তার কনিষ্ঠ ভাই লুতফুল হায়দার চৌধুরীর বাসা থেকে অপহরণ করে। এরপর তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। তার রচিত কিছু গ্রন্থ হচ্ছে, *Colloquial Bengali* (১৯৬৩ ও ১৯৬৬), *বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার* (১৯৬২), *রবি পরিক্রমা* (১৯৬৩), *সাহিত্যের নব রূপায়ণ* (১৯৬৯), *রঙীন আখর* (১৯৬৩)। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি, বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭১(, স্বাধীনতা পুরস্কার (২০১৯) অর্জন করেন।

২৬. মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ওবায়েদ উল্যা

ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে অবিভক্ত বাংলার প্রথম মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ওবায়েদ উল্যা ১৮৭৬ সনে নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানাধীন সল্লাঘটিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সি রমজান আলী এবং মাতার নাম জামিলা খাতুন। তিনি ১৯১০ সালে বরিশলাল জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, শিবপুর মাইনিং কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বি.এসসি ডিগ্রী লাভ করেন।

শিক্ষা জীবন শেষে প্রথমে তিনি ভূপালে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ শাতয়ালেস কোম্পানীতে চাকুরী নিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। একজন খনিজ প্রকৌশলী হিসেবে সমগ্র ভারতবর্ষে তার সাফল্যের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ পাক তার এমন প্রতিভা দিয়েছিলেন যে, তিনি মাটি পরীক্ষা করে বলে দিতে পারতেন কোথায় আছে কিসের খনি। তাঁর সাফল্যের সংবাদ শুনে ১৯১৯ সালের দিকে আফগান বাদশাহ আমানুল্লাহ তাঁকে উচ্চতর বেতন দিয়ে তার দেশে নিয়ে যান। সে সেদেশে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে বাদশাহ আমানুল্লাহ সিংহাসন ত্যাগ করলে ১৯২৯ সালে ওবায়েদ উল্যাহ নোয়াখালী চলে আসেন।

নোয়াখালী ফিরে তিনি মেঘনার করাল গ্রাস থেকে মোঘল আমলের তৈরি নোয়াখালী পুরাতন শহরের স্থাপত্য নিদর্শন ও সরকারী বাস ভবন ইত্যাদি রক্ষার জন্য তৎকালীন বৃটিশ শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি পরিকল্পনা দাখিল করেন। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় প্রধান প্রকৌশলী স্যার এডওয়েস তাঁর প্রস্তাব বিবেচনা না করায় তিনি শূন্য হাতে শিমলা থেকে দেশে ফিরে আসেন। স্বীয় কর্ম পরিকল্পনার উপর পরিপূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস রেখে প্রায় ৫ সহশ্রাধিক শ্রমিককে মাটি ভরাটের কাজে লাগিয়ে ১৯৩০ সালের ৩০শে জানুয়ারি নদীতে বাঁধ দিয়ে এক অবিশ্বাস্য ঘটনার অবতারণা করেন, যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মানুষের ইচ্ছে এবং ত্যাগের দ্বারা যে অসাধ্যকে সাধন করা সম্ভব তা দেখালেন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ওবায়েদ উল্যা। অবশ্য পরবর্তিতে তাঁর সেই বাঁধ প্রভাবশালী কুচক্রী মহল কেটে ফেললে নদীর উত্তাল স্রোতে শেষ পর্যন্ত নোয়াখালী শহর নদী ভাঙ্গনের স্বীকার হয়ে ১৯৪৯ সালে মাইজদীতে স্থানান্তরিত হয়। তবুও জেলার উপকূলীয় অঞ্চলের চতুর্দিকে নির্মিত বর্তমান যে বেড়ি বাঁধের উপকারিতা পাওয়া যাচ্ছে তা মরহুম ওবায়েদ উল্যা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবেরই অবদান।

বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার আশীর্বাদ ক্ষণজন্মা এ মহাপুরতষ নোয়াখালী পৌর সভার চেয়ারম্যান এবং জিলা বোর্ডের সদস্যও ছিলেন। তিনি ১৯৩৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৬০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

২৭. আবদুল মালেক উকিল

নোয়াখালী জেলার কৃতি সন্তান বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞ আইনজীবী মরহুম আবদুল মালেক উকিল নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানার রাজাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ মুন্সী চান্দ মিয়া ও মায়ের নাম মরহুমা নুরুননেছা।

১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে বিএ ও এম এ ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৫২ সালে এল এল বি ডিগ্রী লাভ করেন। কর্ম জীবনের শুরুতেই তিনি ১৯৫২ সালে নোয়াখালী বারে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন এবং পরে ১৯৬৪ সালে ঢাকা হাইকোর্টে যোগ দেন। তিনি ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে বাংলা, বিহার ও আসামে প্রচারকার্যে অংশ নেন। তিনি মহান ভাষা আন্দোলনের সাথে ছিলেন ঘনিষ্ঠ। আন্দোলনের কারণে তাঁকে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ এবং ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি কারা জীবন যাপন করতে হয়। তিনি ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ১৯৫৬ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের নোয়াখালী উপ-নির্বাচনে আওয়ামীলীগের প্রার্থী হিসেবে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে পূনরায় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে গণপরিষদে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে তৃতীয়বারের মত প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হন। পকিস্তানের লাহোর শহরে গুলবার্গে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলনে জনাব মালেক উকিল সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সম্মেলনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি প্রথম উপস্থাপন করেন। ১৯৭০ এর নির্বাচনে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে মরহুম আবদুল মালেক উকিল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য আওয়ামী সংসদীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বের অনেক দেশ সফর করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে জনাব মালেক উকিল ১৯৭৩ ও ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত সদস্য হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত

হন। স্বাধীন দেশের প্রথম মন্ত্রীসভায় তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীএবং পরবর্তীতে জাতীয় সংসদের স্পীকারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের পর আওয়ামী লীগের দুর্দিনে তিনি দলের কান্ডারী হয়ে দলকে সুগঠিত করেন এবং ১৯৭৮ সালে তিনি দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সালের ১৮ অক্টোবর তিনি ইন্তেকাল করেন।

২৮. সাবেক প্রধান বিচারপতি ব্যারিস্টার বদরুল হায়দার চৌধুরীঃ

বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি ব্যারিস্টার বদরুল হায়দার চৌধুরী নোয়াখালী সুধারাম থানাধীন নুরসোনাপুর গ্রামে ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মরহুম খান বাহাদুর মোহাম্মদ গাজী চৌধুরী। তিনি ১৯৪৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ.পাশ করার পর ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি ডিগ্রী নেন।

১৯৫৫ সালে লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে ঢাকা হাইকোর্টের বারে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে তিনি হাইকোর্টের বিচারক হন এবং ১৯৭৮ সালে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে পদোন্নতি পান। ১৯৯০ সালে তিনি প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

দেশের কৃতি সন্তান সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য এই ব্যক্তিত্ব ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ সালে ৭৪ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

২৯. রফিক উল্যা চৌধুরী

রফিক উল্যা চৌধুরী ১৯৩৭ সালের ৮ মে নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানাধীন পাঁচগাও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম হাজী ফজলুর রহমান এবং মাতার নাম জাহিদা খাতুন। ১৯৫৮ সালে অনার্সসহ ইতিহাস বিভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম.এ. পাশ করেন। পরবর্তীতে যুক্তরাজ্য হতে উচ্চতর প্রশাসন বিভাগে এম.এস ডিগ্রী লাভ করেন।

শিক্ষা জীবন শেষে একজন সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৬০ সালে নেত্রকোনার মহকুমা হাকিম, ঢাকার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার এবং অতিরিক্ত জেলা জজ এর দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি প্রধানমন্ত্রীর সচিব, পর্যটন সংস্থার চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ স্টাফ কলেজের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৫৪-১৯৫৯ পর্যমত তিনি ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর একজন ঘনিষ্ঠ ভক্ত হওয়ার কারণে তিনি তাঁর একান্ত সচিব হওয়ার বিরল সুযোগ লাভ করেছিলেন।

৩০. শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক

যে বীর বাঙ্গালির মহান আত্মত্যাগের ফলে ঊনসত্তরের গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে এবং যা শেষ পর্যন্ত মহা মুক্তিযুদ্ধের রূপ নেয় তাদের মধ্যে সার্জেন্ট জহুরুল হক অন্যতম। সার্জেন্ট জহুরুল হক বাঙ্গালির স্বাধীনতার প্রতীক, বীরত্বের প্রতীক, মহান ত্যাগের প্রতীক। পাকিস্তানী শাসকচক্ষু এ দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার চিরতরে নস্যাৎ করার জন্য বাঙ্গালির নিজস্ব সত্ত্বাকে ধ্বংস করার জন্য কতিপয় নেতৃসহানীয় বাঙ্গালির বিরুদ্ধে এনেছিল একটি ষড়যন্ত্র মামলা -ইতিহাসে তা কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ৬ দফা এবং ১১ দফা আদায়ের মাধ্যমে বাংলার বুকে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত প্রতিটি বাঙ্গালি যখন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল এবং প্রস্তুতি নিচ্ছিল ঠিক তখনই জাতীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আনা হয় এ মামলা। এ মামলা ছিল তখন বাঙ্গালি জাতি সত্ত্বার প্রতি এক বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এ ষড়যন্ত্র মামলা যদি পাকিস্তানীদের অনুকূলে যেত তাহলে আজ বাঙ্গালি জাতির জীবন প্রবাহ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতো। বিশ্বের মানচিত্রে হয়তো বাংলাদেশ নামে কোন দেশের অস্তিত্ব থাকতো না। কিন্তু বাংলার মানুষ সেটি হতে দেয়নি। পাকিস্তানী কারাগারে আটক থেকেও সার্জেন্ট জহুরুল হক আপোষ করেননি, বরং পাক বাহিনীর রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে বুক পেতে বুলেট বরণ করেছেন। ১৯৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসে পাকিস্তানী সৈন্যের গুলিতে শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন সার্জেন্ট জহুরুল হক।

সার্জেন্ট জহুরুল হক ১৯৩৫ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানাধীন সোনাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৩ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন একজন কৃতি ক্রীড়াবিদ ও চিত্র শিল্পী। তাঁর অঙ্কিত অনেক শিল্পকর্ম ঢাকায় জাতীয় যাদুঘরে মর্যাদার সাথে সংরক্ষিত আছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ইকবাল হলের নাম পরিবর্তন করে "সার্জেন্ট জহুরুল হক হল" রাখা হয়েছে।